ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জসীমউদ্‌দীন

*প্রফেসর ড. মাযহারুল ইসলাম তরু

সারসংক্ষেপ: বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা কাব্যজগতে জসীম উদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) আগমন। সে সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সৃষ্টিবৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যকে পুরোপুরি প্রভাবিত করে রেখেছিল। অন্যদিকে আরেক দিকপাল কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সঙ্গীত ও কবিতা তখন ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাব থেকে বেরিয়ে যার বাংলা কাব্যে শুভাগমন ঘটে–তিনি পল্লীকবি জসীম উদ্দীন। সাহিত্য চর্চায় রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ভিন্নধারার তথা রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হলেও জসীম উদ্‌দীনের সঙ্গে ছিল বাংলা সাহিত্যের এই দিকপাল কবির যথেষ্ট হৃদ্যতা। তিনি লাভ করেছেন তাঁর স্নেহধন্য আশীর্বাদ। তাঁর লেখার গভীরতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বিশ্বকবি করেছেন অনেক সুন্দর ও অর্থবহ মন্তব্য। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্বকবির সাথেতাঁর সম্পর্ক ও সাহিত্য বিষয়ে জসীম উদ্‌দীনের অনুভূতির কথা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ত্রিশোত্তর যুগের বেশ কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক ভিন্ন ধারার অন্বেষণ করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা ও মননের অধিকারী ভিন্নধারার এই প্রতিবাদী কবিরা নতুন কাব্যভঙ্গি, জীবনদৃষ্টি ও কাব্যবোধ অনুসরণ করার সুযোগ পান। তাঁরা তাঁদের কাব্যে নগরজীবনের যন্ত্রণা, ক্লান্তি, অবসাদ ও অস্থিরতার চিত্র তুলে ধরেন। কবি জসীম উদ্‌দীন ছিলেন সে সময়ের এক উল্লেখযোগ্য কবি। তাই তাঁর কবিতাও ছিল নগরজীবনের নানা সংকট ও আবর্তে আচ্ছন্ন। প্রথম মহাযুদ্ধ উত্তরকালে পৃথিবীময় যুদ্ধের ধ্বংসলীলার যে প্রভাব পড়েছিল, ভারতবর্ষের নগরজীবন তাতে প্রভাবিত হয়েছিল। হতাশা, নৈরাশ্য আর দীনতায় হাঁপিয়ে উঠেছিল মানুষ। নগরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষেরা সে সময় অভাব-অনটন আর সাংস্কৃতিক টানা পোড়েনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জসীম উদ্‌দীন এ থেকে মুক্তি খুঁজছিলেন তাঁর[১] শৈশব কৈশোরের মধুর স্মৃতিঘেরা কাজল গাঁয়ে। আহ্বান জানিয়েছেন-

তুমি যাবে ভাই-যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়;
মায়া-মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি
মায়ের বুকেতে বোনের আদরে ভায়ের স্নেহের ছায়।[২]

রবীন্দ্র-নজরুলের সমকালে এই প্রথম কোন কবি এমন করে পল্লী বাংলার রূপময় মমতাময় চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর বাণীতে পল্লীজননী হয়ে উঠেছে শ্বাশতকালের জননী। প্রকৃতির কোলে লালিত সন্তান বলে সেই চেতনার ধারক তাঁর কবিতা। এ জসীম উদ্‌দীনের স্বভাবজাত, হৃদয়জাত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এ যেন আপন অনুভবের ফল্গুধারা। Sir Ifor Evans এর ভাষায়, "A poet cannot write the poetry he wants to write but the poetry that is within him." এ কবির আত্মগত উপলব্ধির সহজাত বিকাশ।

---

* অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

রবীন্দ্রনাথকে জসীম উদ্‌দীন প্রথম দেখেছিলেন 'শেষ বর্ষণ' নাট্যানুষ্ঠানে বাল্যকালে। তবে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও কথা-বার্তা হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র মোহনলাল ছিলেন জসীম উদ্‌দীনের বাল্যবন্ধু। তিনিই এই নবীন কবির সঙ্গে কবিগুরুর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন।[৩]

কবিগুরুর সঙ্গে সাক্ষাতের সেই মুহূর্তের কথা জসীম উদ্‌দীন তাঁর *ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়* গ্রন্থে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন,

> অবনীন্দ্রনাথের বাড়ি হইতে রবীন্দ্রনাথের ঘর তিন মিনিটের পথও নয়। এই এতটুকু পথ অতিক্রম করিতে মনে হইল যেন কত দূরের পথ যাইতেছি। আমার বুক অতি আনন্দে দুরুদুরু করিতেছিল। ঘরের সামনে আসিয়া আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া মোহনলাল ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমি যেন কোন অতীত যুগের তীর্থযাত্রী। জীবনের কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া আজ আমার চির-বাঞ্ছিত মহামানবের মন্দিরপ্রান্তে আগমন করিয়াছি। ছবির উপরে ছবি মনে ভাসিয়া আসিতেছিল। এতদিন এই কবির বিষয়ে যাহা ভাবিয়াছি, যাহা পড়িয়াছি, যাহা শুনিয়াছি সব যেন আমার মনে জীবন্ত হইয়া কথা কহিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে মোহনলাল আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমি যেন কোন কল্পনার জগতে প্রবেশ করিলাম। সুন্দর কয়েকখানি ছবি দেয়ালে টাঙানো। এখানে সেখানে সুন্দর সুপরিকল্পিত চৌকোণা আসন। তাহার উপরে নানা রঙের ডোরা-কাটা বস্ত্র-আবরণ। সেগুলি বসিবার জন্য না দেখিয়া চোখের তৃপ্তি লাভের জন্য কে বলিয়া দিবে! এ যেন বৈদিক যুগের কোন ঋষির আশ্রমে আসিয়াছি।[৪]

সে সময়েই জসীম উদ্‌দীন তাঁর *রাখালী* (১৯২৭) ও *নক্সী কাঁথার মাঠ* (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বই দুটি পেয়ে খুশি হন। তিনি বই দুটি নেড়েচেড়ে বলেছিলেন– "আমার মনে হচ্ছে তুমি বাংলাদেশের চাষী মুসলমানদের বিষয়ে লিখেছো। তোমার বই আমি পড়ব।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুনে জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত আনন্দিত হন। নিজের বই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বিশ্বনন্দিত কবি কি বলবেন না বলবেন তা নিয়ে তাঁর মনে নানা জল্পনা-কল্পনার উদয় হয়, বৃদ্ধি পায় মানসিক উত্তেজনা । এর দুই-তিনদিন পর ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের মধ্যম পুত্র অধ্যাপক তরুণ সেন কবিকে ডেকে বলেন,

> তুমি কবিকে বই দিয়ে এসেছিলে। আজ দুপুরে আমাদের সামনে কবি অনেকক্ষণ ধরে তোমার কবিতার প্রশংসা করলেন। এমন উচ্ছ্বসিতভাবে কারো প্রশংসা করতে কবিকে কমই দেখা যায়। কবি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, তিনি তোমাকে শান্তিনিকেতন নিয়ে যাবেন।[৬]

অধ্যাপক তরুণের এই কথা শুনে পরের দিনই তরুণকবি জসীম উদ্‌দীন রবীন্দ্র-তীর্থে হাজির হয়েছিলেন। জসীম উদ্‌দীন যে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জসীম উদ্‌দীনকে বলেছিলেন, "আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েই তোমার বই দুখানির উপর বিস্তৃত সমালোচনা নিয়ে পাঠাবো। তুমি শান্তিনিকেতনে এসে থাকো। ওখানে আমি তোমার একটা বন্দোবস্ত করে দেব।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন হয়ে গেলেও কবিগুরুর কাছ থেকে বইয়ের আলোচনা আসছে না দেখে– জসীম উদ্‌দীন অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর বন্ধু মোহন-লালকে পাঠালেন কবিগুরুর কাছে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাই তাঁর মাধ্যমে লিখে পাঠালেন–"জসীম উদ্‌দীনের কবিতার ভাব, ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লেখার শক্তি নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।"[৮]

তাঁর কবিতার এই সামগ্রিক মূল্যায়নে জসীম উদ্‌দীন খুব তৃপ্ত হয়েছিলেন। তবে একথা বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শুধু কবি স্বীকৃতি নয়, জসীম উদ্‌দীন যে আলাদা একটি যুগ, পৃথক একটি বিদ্রোহ সত্তা– প্রকারান্তরে তাও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বস্তুত আধুনিক কবিস্বভাবে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে জসীম উদ্‌দীন বিদ্রোহী ছিলেন।[৯]

একই বছর (১৯৩০) জসীম উদ্‌দীনের *বালুচর* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে এর কবিতাগুলো সে সময়ের সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হচ্ছিল। প্রকাশিত সেই সব কবিতাগুলো নিয়ে সমালোচকরা কবির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাঁদের মতে, 'কবিতাগুলো একঘেঁয়ে এবং ছন্দ গতানুগতিক। তাই ছন্দ ও বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা প্রয়োজন।' জসীম উদ্‌দীন সমালোচকদের এসব মন্তব্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বিষয়টি উত্থাপন করেন। কবিগুরু তাঁর কথাগুলা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন। তিনি তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য বলেন, "ওসব বাজে লোকের কথা শুনোনা। যে ছন্দ সহজে তোমার কাছে এসে তোমার লেখায় ধরা দেয়, তাই ব্যবহার করো, ইচ্ছে করে নানা ছন্দ ব্যবহার করলে তোমার লেখা হবে তোতাপাখির বোলের মতো। তাতে কোন প্রাণের স্পর্শ থাকবে না।"[১০] কবিগুরুর এই কথা শুনে জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত উৎসাহবোধ করেন। *বালুচর* গ্রন্থের কবিতাগুলো রচনাকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

বালুচর প্রকাশের পর জসীম উদ্‌দীন এর একটি সৌজন্য কপি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহার হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি গ্রন্থটি সম্পর্কে মতামত দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। কিন্তু বইটি সম্পর্কে কবিগুরু কোন মতামত দেননি। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর কোন মতামত না পেয়ে জসীম উদ্‌দীন জোড়াসাঁকোতে ছুটে যান। বিনীতভাবে তিনি বইটি সম্পর্কে মতামত না দেয়ার কারণ জানতে চাইলে কবিগুরু মৃদু হেসে বললেন,

> তোমার *বালুচর* পড়তে নিয়ে বড়ই ঠকেছি হে। বালুচর বলতে আমি তোমার দেশের সুদূর পদ্মাতীরের চরগুলির সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আশা করেছিলাম। যেমন চখাচখি উড়ে বেড়ায়, কাশফুলের গুচ্ছগুলি বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু কতকগুলি প্রেমের কবিতা দিয়ে তুমি বইখানাকে ভরে তুলেছ। পত্রে একথা লিখলে, পাছে রূঢ় শোনায় সে জন্য এ বিষয়ে কিছুলিখিনি। মুখেই বললাম।[১১]

তবে বইটি যে কবির ভালো লেগেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীতে কবিগুরু তাঁর সম্পাদিত *বাংলা কবিতার সংকলনে* জসীম উদ্‌দীনের *বালুচর* কাব্যগ্রন্থ থেকে *উড়ানীর চর* কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

জসীম উদ্‌দীন প্রতিনিয়তই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। কোন লেখা প্রকাশিত হলেই তিনি তা কবিগুরুকে পাঠাতেন এবং তাঁর মতামত জানতে চাইতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের মতামত নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। ১৯৩৩ সালে জসীম উদ্‌দীনের কাব্যোপন্যাস *সোজন বাদিয়ার ঘাট* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ছোটবড় মোট ২২টি পরিচ্ছেদে দুই ভিন্ন সমাজের কিশোর-কিশোরীর প্রণয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত এই কাব্যকাহিনী প্রকাশের পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। জসীম উদ্‌দীন এই গ্রন্থটিও রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। তিনি *সোজন বাদিয়ার ঘাট* পাঠ করে একটি চিঠিতে জসীম উদ্‌দীনকে তাঁর মতামত জানান। তিনি লিখেন, "তোমার *সোজন বাদিয়ার ঘাট* অতীব প্রশংসার যোগ্য। এই বই যে বাংলার পাঠক সমাজে আদৃত হবে সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই।"[১২]

রবীন্দ্রযুগেই রবীন্দ্র বিরোধিতা ব্যাপক আকার পরিগ্রহ করে। সমকালীন আধুনিক কবিরা কাব্যবস্তুর বৈচিত্র্য সাধনে, নতুন বাণীভঙ্গির প্রবর্তনায়, অভিনব রূপ-প্রতীকের ব্যবহার নৈপুণ্যে ও কাব্যের দেহে-মননে দীপ্তি সঞ্চারে অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে এঁরা রবীন্দ্র-নজরুলের রোমান্টিক কাব্যধারার বিরুদ্ধে একটা সাহসিক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছিলেন।[১৩]

রবীন্দ্র-বিরোধী এসব কবিদের মতো রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত ছিলেন জসীম উদ্‌দীন। তবে রবীন্দ্র স্নেহধন্য এই তরুণকবি কবিগুরুকে বিষয়টি কৌশলে অবগত করে এ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে সচেষ্ট হন। কবিগুরুকে তিনি বলেন–

> আজকাল একদল অতি আধুনিক কবির উদয় হয়েছে। এরা বলে, সেই মান্ধাতার আমলে চাঁদ, জোছনা ও মৃগনয়নের উপমা আর চলেনা। নতুন করে উপমা-অলঙ্কার গড়ে নিতে হবে। গদ্যকে এরা কবিতার মতো করে সাজায়। তাতে মিল আর ছন্দের আরোপ বাহুল্যমাত্র। এলিয়টের আর এজরা পাউন্ডের মত করে এরা লিখতে চায়। বলুন ত, একজনের মতন করে লিখলে তা কবিতা হবে কেন? কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই যদি না থাকল তার প্রকাশে, তাকে কবি বলে স্বীকার করব কেন? দিনে দিনে এদের দল বেড়ে যাচ্ছে। এরা অনেকেই বেশ পড়াশোনা করে। বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য। তার দৌলতে এরা নিজের দলের স্বপক্ষে বেশ জোরালো প্রবন্ধ লেখে।[১৪]

জসীম উদ্‌দীনের এ কথায় রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই অতি আধুনিক কবিদের পক্ষে রায় দেননি। রবীন্দ্রনাথ এই কবিদের সম্বন্ধে কখনোই সংশয় মুক্ত হতে পারেন নি।[১৫] তিনি তাঁকে আরো বলেন-

> এজন্য চিন্তা করো না। এটা একটা সাময়িক ঘটনা। মেকির আদর বেশিদিন চলে না। একথা জেনো, ভালো লেখকের সংখ্যা সকল কালেই খুব কম। আর মন্দ লেখকেরা সংখ্যায় যেমন বেশি, শক্তির দাপটও তেমনি অজেয়। কিন্তু কালের মহাপুরুষ চিরকালই সেই অল্প সংখ্যক দুর্বল লেখকদের হাতে জয়পতাকা তুলে দেন।[১৬]

জসীম উদ্‌দীনের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল বলেই তাঁকে তিনি এত গভীর ও অর্থবহ কথা বলতে পেরেছেন।

জসীম উদ্‌দীন বেশ কয়েকটি নাটক ও গীতিনাট্য লিখেছেন। এসব সৃষ্টিকর্মের মধ্যে *পল্লীবধূ* (১৯৫৬), *গ্রামের মায়া* (১৯৫৯), *ওগো পুষ্প ধনু* (১৯৬৮) ও *আসমান সিংহ* (১৯৬৮) নাটক, *পদ্মাপার* (১৯৫০) গীতিনাট্য এবং *বেদের মেয়ে* (১৯৫১), *মধুমালা* (১৯৫১) প্রভৃতি লোকনাট্য উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। তাঁর উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে জসীম উদ্‌দীন আনন্দে আপ্লুত হয়ে কবিগুরুর কাছে নাটকের একটি প্লট চেয়ে বসেন। কবিগুরু চিন্তা-ভাবনা করে পরবর্তীতে চমৎকার একটি প্লট দিবেন বলে তাঁকে আশ্বাস দেন। কবি জসীম উদ্‌দীন তাঁর স্মৃতি চারণায় সেই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

> রচনার নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে একদিন আমি পাড়াগাঁয়ের লোকনাট্য- আসমান সিংহের পালার উল্লেখ করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে কবি আমাকে বলিলেন, 'তুমি লেখ না একটা গ্রাম্য নাটক।' আমি বলিলাম, 'নাটক আমি একটা লিখেছি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়ে বললেন, নাটক লেখার শক্তি তোমার নেই।' কবি একটু জোরের সঙ্গে উত্তর করিলেন, 'অবন নাটকের কি বুঝে? তুমি লেখ একটা নাটক তোমাদের গ্রাম দেশের কাহিনী নিয়ে। আমি শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে দেবো।'[১৭]

এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় পল্লীকবি বলেন, 'একটা প্লট যদি দেন তবে আর একবার চেষ্টা করে দেখি।' কবি বললেন, "আজ নয়। কাল সকালে এসো।' পরদিন কবির সামনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একথা সেকথার পরে আমার নাটকের প্লট দেওয়ার কথা কবিকে মনে করাইয়া দিলাম। কবি হেসে বললেন, 'তুমি দেখছি, ছাড়বার পাত্র নও। চোরের মন বোচকার দিকে।' নিকটে আরও দু-একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরা হেসে উঠলেন। কবি প্লট বলতে লাগলেন:

> ধর, তোমাদের পাড়াগাঁয়ের মুসলমান মোড়লের ছেলে কলকাতায় এম,এ, পড়তে এসেছে। বহু বৎসর সে বাড়ি যায় না। এম,এ, পাশ করে সে বাড়ি এসেছে। বাবা, মা সবাই তাদের পুরানো গ্রাম্য রীতিনীতিতে তাকে আদরযত্ন করলেন। কিন্তু ছেলের এসব পছন্দ হয় না। সে বলে, তোমরা যদি আমাকে এমন করে আদর অভ্যর্থনা না করতে তবেই ভাল হত। আদর করেই তোমরা আমাকে আরো অপমান করছ।'[১৮]
>
> ছেলেটির সঙ্গে গ্রামের অন্য একজন মোড়লের মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের কথা বাপ বলতেই ছেলে রেগে অস্থির। অমুকের মেয়ে অমুক- সেই ছোট্ট এতটুকু মেয়ে, তাকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। একটা গ্রাম্য চাষী সে হবে তার শ্বশুর![১৯]

প্লট বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আরও বললেন,

> তখন মেয়েটির অন্যত্র বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। সেই পাকা দেখার দিন ছেলেটা মেয়েটির বাড়িতে কি উপলক্ষে গিয়ে তাকে দেখে এলো। ছেলেবেলায় যাকে সে একরত্তি এতটুকু দেখিছিল আজ সে পরিপূর্ণা যুবতী। ছেলের মনে হল, এমন রূপ যেন সে আর কোথাও দেখেনি।
>
> বাপ ছেলেকে বড়ই ভালবাসেন। বাপ যখন দেখলেন কিছুতেই ছেলের মন দেশে টিকছে না, তিনি তখন ছেলেকে গিয়ে বললেন, "দেখ, অনেক ভেবে দেখলাম, দেশে থাকা তোর পক্ষে বড় মুশকিল। তুই কলকাতায় চলে যা। এখানকার জলবায়ু ভাল না। কখন

> অসুখ করবে কে জানে। মাসে মাসে তোর যা টাকা লাগে আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দেব। তুই কলকাতায় চলে যা।"[২০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কল্পনা শক্তি বিস্তৃতির মাধ্যমে নাটকের প্লটের যবনিকাপাত করেন যা *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়* গ্রন্থে কবি জসীম উদ্‌দীন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন:

> তখন ছেলে এক মস্ত বক্তৃতা দিল। কে বলে যে এ গ্রাম আমার ভাল লাগে না। ছেলেবেলা থেকে আমি এখানে মানুষ হয়েছি। এ গাঁয়ের গাছপালা লতাপাতা সব আমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী।[২১]
>
> বাপ তো অবাক। হঠাৎ ছেলের মন ঘুরে গেল কি করে। ছেলের কোন বন্ধুর মারফত বাপ জানতে পারলেন, যে মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ের কথা স্থির হয়েছিল তাকে দেখে সে পাগল হয়ে এসেছে। তখন বাপ ছুটলেন মেয়ের বাপের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গেছে। মেয়ের বাপ কথা বদলাতে রাজি নয়।
>
> এবার গল্পটিকে ট্রাজেডিও করতে পার, কমেডিও করতে পার। যদি ট্রাজেডি করতে চাও, লেখ বিয়ের পরে মেয়েটির সঙ্গে আবার একদিন ছেলেটির দেখা হল। মেয়েটি ছেলেটিকে বলল, আমাদের যা কিছু কথা রইল মনে মনে। বাইরে মিলন আমাদের হল না। কিন্তু মনের মিলন থেকে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারবে না।[২২]

রবীন্দ্রনাথের এই প্লট অবলম্বন করেই জসীম উদ্‌দীন *পল্লীবধূ* নাটকটি রচনা করেন। কিন্তু নাটকটি শেষ করার পূর্বেই কবিগুরু পরলোকগমন করেন। নাটকটি ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। কবিগুরুকে নাটকটি দেখাতে না পেরে জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাই তিনি তাঁর *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়* গ্রন্থে আক্ষেপ করে লিখেছেন,

> কবি জীবিত থাকিতে তাঁহাকে এই নাটক দেখাইতে পারি নাই। 'পল্লীবধূ' নাম দিয়া এই নাটক কয়েক বৎসর পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা বেতারে এই নাটক অভিনীত হইয়া শতশত শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়াছে। আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতেন তাঁহাকে এই নাটক উপহার দিয়া মনে মনে কতই না আনন্দ পাইতাম।[২৩]

১৯৩৯ সালে জসীম উদ্‌দীন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৬ বছর। ১৬ বছর বয়সী বধুর নাম মমতাজ বেগম মনিমালা। তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান হয় খুব ধুমধাম করে। কনের জন্য কলকাতা থেকে বিয়ের শাড়ি ১৭০ টাকা দিয়ে কিনে আনা হয়। আর বরের জন্য শেরোয়ানি কাপড়, পাগড়ি ও নাগরা জুতা। গায়ে হলুদের দিন আটটি ঘোড়াকে সাজিয়ে সব জিনিসপত্তর নিয়ে সারা শহর ঘুরানো হয়।[২৪]

বিয়েতে জসীম উদ্‌দীন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। কবিগুরুর পক্ষে বিয়েতে আসা সম্ভব না হলেও শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন। তিনি চিঠির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা দুটি পাখির ছবিসম্বলিত একটি শুভেচ্ছা কার্ড পাঠিয়ে ছিলেন।[২৫]

জসীম উদ্‌দীন অসংখ্য গ্রাম্যগান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর এই সংগ্রহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রায়ই এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখতেন। একবার তিনি জসীম উদ্‌দীনকে ডেকে বলেন, "তোমার সংগ্রহ থেকে কিছু গ্রাম্যগান আমাকে দাও। আমার বইয়ে ছাপব।" জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর সংগৃহীত বেশকিছু গান

কবিগুরুকে পৌঁছে দেন। কিন্তু কবিগুরু তাঁর সংকলনে গানগুলো অন্তর্ভুক্ত করেননি। এ সম্পর্কে জসীম উদ্‌দীন কিছু জানতে না চাইলেও কবিগুরু তাঁকে একদিন বলেন,

> ওহে, তোমার সংগ্রহ করা গানগুলি পড়লাম। আমাদের দেশের রসপিপাসুরাও গানগুলোর আদর করবে। কিন্তু আমি বইটি সংকলন করেছি বিদেশী সাহিত্যিকদের জন্য। অনুবাদে এগুলির কিছুই থাকবে না।[২৬]

জসীম উদ্‌দীন এতে মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ *মৈমনসিংহ গীতিকা* থেকে কিছু গান তাঁর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।[২৭]

জসীম উদ্‌দীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে ৪৩ বছরের ছোট ছিলেন। আর বয়সের এতো ব্যবধানের সত্ত্বেও তিনি এই প্রতিভাবান কবিকে অত্যন্ত প্রীতি ও স্নেহের চোখেই দেখেছিলেন। এই স্নেহের সম্পর্কের কারণেই কবিগুরু জসীম উদ্‌দীনের কবিতা, গান ও নাটক সম্পর্কে অবাধে সুচিন্তিত ও অভিজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করেছেন। এতে রবীন্দ্রনাথের উদার মনোভাব ও মানবিকতার যে চিত্র পাওয়া যায় তা সত্যি দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথ জসীম উদ্‌দীনকে তাঁর একান্ত আপনজন হিসেবে মনে করতেন। কিভাবে তিনি কবিগুরুর এতো কাছের মানুষে পরিণত হয়েছিলেন তা উদ্ধার করা গবেষণার বিষয়। তবে একথা বলা যায় যে, জসীম উদ্‌দীন তাঁর অসামান্য প্রাণ-প্রাচুর্য ও প্রতিভার গুণে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের ছোঁয়া ও আশীর্বাদ লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এই মহৎ প্রাণের ছোঁয়া আর আশীর্বাদ লাভ করেই জসীম উদ্‌দীন একজন খাঁটি বাঙালি এবং বড় কবি হয়ে ওঠার সম্মান ও গৌরব অর্জন করেছিলেন।

তথ্যসূচিঃ

---

০১. তাহমিনা বেগম, *কবি জসীম উদ্‌দীন এবং তাঁর পল্লী মানস*, জসীম উদ্‌দীন জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৮৬

০২. জসীম উদ্‌দীন, *ধান খেত*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ-১৯৭০, পৃ. ৩৫

০৩. তিতাস চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের চোখে জসীম উদ্‌দীন*, জসীম উদ্‌দীন জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৪৪

০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

০৮. জসীম উদ্‌দীন, *ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়*, জসীম উদ্‌দীন জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৫৬৬

০৯. তিতাস চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

১৩. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য-সমীক্ষা*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৮৩

১৪. জসীম উদ্‌দীন, *ঠাকুরবাড়ির অঙিনায়*, পৃ. ৫৬৭
১৫. অমিয় চক্রবর্তী, মানবতাবাদী ও কবি ভবতোষ দত্ত, দেশ ১৯ জুলাই ১৯৮৬
১৬. জসীম উদ্‌দীন, *ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়*, জসীম উদ্‌দীন জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৫৬৬
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮
১৮. অমিয় চক্রবর্তী, মানবতাবাদী ও কবি ভবতোষ দত্ত, দেশ ১৯ জুলাই ১৯৮৬
১৯. তিতাস চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬
২২. জসীম উদ্‌দীন, *ঠাকুরবাড়ির অঙিনায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০
২৪. জসীম উদ্‌দীন জন শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, জীবনপঞ্জী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮
২৫. রবীন্দ্রতীর্থে, জসীম উদ্‌দীন জন শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮০
২৬. জসীম উদ্‌দীন, ঠাকুরবাড়ির অঙিনায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০
২৭. তিতাস চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮।